৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

Starting at 7:15 pm

WELCOME

লেকচার: ০৪

টপিক:

প্রধান ধারণা ও মতবাদ: জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নব্য উপনিবেশবাদ, উত্তর আধুনিকতাবাদ, বিশ্বায়ন ও নয়া বিশ্বব্যবস্থা।

বৈশ্বিক পরিবেশ: পরিবেশগত ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু অভিযোজন ও জলবায়ু কূটনীতি।

জাতীয়তাবাদ

- নিজেকে কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা। অর্থাৎ, সেই জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিকাশ, অগ্রগতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ- সামাজিক রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে একাত্মবোধ করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতির এই মূল্যবোধ স্বকীয়তার রক্ষা ও বিকাশে বিশ্বাসী হওয়ার মধ্য দিয়েই জাতিয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে। জাতীয়তাবাদ মূলত ইউরোপীয় ধারণা।

ভাষা, রীতি ভাষা রীতি

- অধ্যাপক লাস্কির মতে, "জাতীয়তাবাদ সাধারণ ভাবে এক ধরনের মানসিকতা। এটি দু'ধারায় পরিপূর্ণ- একটি পুরনো স্মৃতি সম্পদ এবং অন্যটি পরস্পরের একত্রে বসবাস করার সম্মতি।"

- Hans Kohn এর মতে, "জাতীয়তাবাদ মূলত একটি মানসিক অবস্থা, যা এক প্রকার সচেতনতা"

- L. L. Sryder এর মতে, "জাতীয়তাবাদ একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী মানুষের/ জনসমষ্টির মানসিকতা, অনুভূতি ও চিন্তা চেতনার ফল।"

- বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী আরনল্ড টয়েনবির মতে, "জাতীয়তাবাদ কোনরূপ বস্তুগত বা যান্ত্রিক কিছু নয়, বরং তা প্রাণবন্ত মানুষের আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি"।

❖ জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য:

১. নিজেদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ।
২. বিশ্বের অন্যান্য জনসমাজ থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধ।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

জাতীয়তাবাদ বলতে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিশেষ ঐক্যানুভূতিকে বোঝায় যার দ্বারা এর অন্তর্গত জন সমষ্টিকে বাকি মানব সমাজ থেকে সহজেই পৃথক করা যায়। ঐক্যের এই অনুভূতি ওই বিশেষ জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘকালের সাধারণ ও সর্বজনীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও একত্রে বসবাস থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে।
নিজেকে কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা, সেই জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিকাশ, অগ্রগতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক , রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে একাত্মবোধ করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতির ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, স্বকীয়তা রক্ষা ও বিকাশে বিশ্বাসী হওয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে। ১৭৭০ দশকের শেষের দিকে জোহান গটফ্রাইড হারভার 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

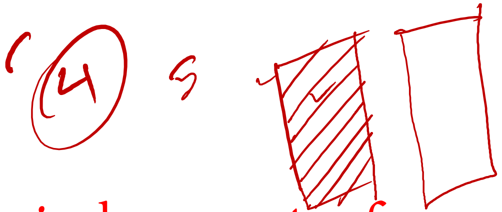

- **হ্যান্স কোঁ বলেন**, "Nationalism is first and foremost a state of mind, an act of consciousness" অর্থাৎ "জাতীয়তাবাদ প্রথম ও সর্বাগ্রে এক মানসিক অবস্থা, এক বিশেষ চেতনামূলক সৃষ্টিস্বরূপ।"
- **প্যাডেলফোর্ড ও লিংকন বলেন**, "জাতীয়তাবাদ দুটি উপাদানের সংমিশ্রণ বিশেষ। একটি জাতীয়তার ধারণা সম্পর্কিত আদর্শবাদ, আর অন্যটি জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঐ আদর্শবাদকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপদান।"

জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

- ভৌগোলিক ঐক্য
- বংশগত ঐক্য
- ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য
- ধর্মীয় ঐক্য
- ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য
- রাজনৈতিক ঐক্য
- ভাবগত ঐক্য

জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক

জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক দিক	জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক দিক
✓ পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহ দান করে; ✓ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে; ✓ জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম বৃদ্ধি করে; ✓ দলমত নির্বিশেষে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে;	✓ দ্বন্দ্বের বিস্তার করে; ✓ সাম্রাজ্যবাদের আশঙ্কা তৈরি করে; ✓ নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অগণতান্ত্রিক ধারণার জন্ম দেয়; ✓ বিশ্বশান্তির বিঘ্ন ঘটায়; ✓ অন্ধ জাতীয়তাবাদ নাগরিকদের মধ্যে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে; ✓ বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎসাহ দেয়; ✓ জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে; ✓ সংস্কৃতি বিকাশে বাধা দেয়। ✓ বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিপন্থী।

বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদ

খাদ্য জাতীয়তাবাদ: প্রাকৃতিক দুযোর্গ বা যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে কোনো দেশে খাদ্য উৎপাদন কম হলে বা খাদ্য সংকট দেখা দিলে কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের জনগণের কথা চিন্তা না করে নিজ রাষ্ট্রের জনগণের খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করে রাখে এবং খাদ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেয় তখন তাকে খাদ্য জাতীয়তাবাদ বলে। কোনো দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু সংকটকালীন সময়ে অন্যদের কোনো ধরনের সুযোগ না দিয়ে ‘মাই নেশন ফার্স্ট’ নীতির আলোকে নিজ দেশের জন্য খাদ্য মজুত করে তখনই খাদ্য জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়।

কোভিড-১৯ মহামারী এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিভিন্ন দেশের সরকার খাদ্য রপ্তানি যেভাবে নিষিদ্ধ করেছিল তাকে ‘খাদ্য জাতীয়তাবাদ’ বলে আখ্যা দিয়েছিল সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইউ স্কুল অব পাবলিক পলিসির সহকারী অধ্যাপক সোনিয়া আক্তার।

বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদ

ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ: যখন কোনো দেশের সরকার অন্য দেশকে সুযোগ না দিয়ে নিজ দেশের জন্য ভ্যাকসিন নিশ্চিত করে ফেলে, তখন তাকে ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ বলে। এর সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, বিশ্বের ধনী দেশগুলো নিজ দেশের মানুষের জীবন নিয়েই শুধু চিন্তা করে, অন্য দেশকে সাহায্য করা কিংবা অতিমারির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে লড়াই করার কোনো মনোভাব তাদের মধ্যে থাকে না। ফলে বিশ্বব্যাপী ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে নতুন ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এই জাতীয়তাবাদ বিশ্ব স্বাস্থ্যকে শুধু একটি ব্যবসা হিসেবেই দেখে। করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ চরম আকার ধারণ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ‘মাই নেশন ফার্স্ট’ ধারণায় উদ্দীপ্ত হয়ে করোনা ভ্যাকসিন বাজারে আসার আগেই ধনী দেশগুলো প্রি অর্ডারের মাধ্যমে কোটি কোটি ডোজের প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ নতুন নয়। ধনীরা আগাম চুক্তির মাধ্যমে ভ্যাকসিন কিনে নেয়ায় ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি হওয়া সত্ত্বেও এইচ৫এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন কিনতে পারেনি। ২০০৯ সালে ধনী দেশগুলো এইচ১এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা (সোয়াইন ফ্লু নামে পরিচিত) ভ্যাকসিনের প্রায় সব ডোজ কিনে নেয়ায় বেশি আক্রান্ত দেশগুলো ভ্যাকসিন পায়নি।

WHO

আন্তর্জাতিকতাবাদ (Internationalism)

জাতীয়তাবাদের বিপরীত ধারণা হলো আন্তর্জাতিকতাবাদ। এটি এমন এক রাজনৈতিক দর্শন বা মতবাদ যা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক সংহতি, নির্ভরশীলতা এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে। উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা দূর করে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও বিশ্ব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করে। গণতন্ত্রের বিকাশে আন্তর্জাতিকতাবাদ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও বিশ্বায়ন, অবাধ বাণিজ্য ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধারণা এসেছে এই আন্তর্জাতিকতাবাদ হতেই। জাতীয় স্বার্থের সাথে মানুষ যখন বিশ্বমানবের কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি যত্নবান হয় তখনই তা আন্তর্জাতিকতাবাদে রূপ লাভ করে।

বর্তমান পৃথিবীতে ১৯৫টি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ রয়েছে। তারা নিজেদের প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক চেতনায় ভর করে সম্পর্ক স্থাপন করে চলছে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের মনোভাব গড়ে তুলতে, বিরাজমান নানা সমস্যা ও সংকট দূরীকরণে, অগ্রগতি ও মঙ্গল নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোতে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সার্বিক সহযোগিতা আন্তর্জাতিক চেতনার উপর নির্ভর করে।

উগ্রজাতীয়তাবাদ
↓ (ক্যারিশ্মা)
অন্ধ জাতীয়তাবাদ

i

ii

iii

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সম্পর্ক

জাতীয়তাবাদ যেখানে নির্দিষ্ট কোনো জাতির কল্যাণ, মর্যাদা ও সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে চিন্তা করে, আন্তর্জাতিকতাবাদ সেখানে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মানব জাতির চিন্তায় মগ্ন। উগ্র বা বিকৃত জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী। কিন্তু সুস্থ জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী নয়। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ একে অপরের পরিপূরক। তত্ত্বগতভাবে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আন্তর্জাতিকতাবাদে জাতীয়তাবাদ বিলুপ্ত হয় না। আন্তর্জাতিকতা সকল জাতির স্বকীয়তা বজায় রেখে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ যখন সঠিক পথে পরিচালিত হয় তখন একে অপরের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

আধুনিক কালে জাতীয়তাবাদ বহুলাংশে আন্তর্জাতিকতাবাদে রূপ লাভ করেছে। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনাও সম্প্রসারিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পার্থক্য

V.V.I.

বিষয়বস্তু	জাতীয়তাবাদ	আন্তর্জাতিকতাবাদ
১. সংজ্ঞা	জাতীয়তাবাদ হলো একটি মানসিক চেতনা যার ফলে এক জাতি অন্য জাতি থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে।	আন্তর্জাতিকতাবাদ হলো মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন যা বৈষম্য দূর করে বিশ্বের সকল মানুষকে সমান ভাবতে সাহায্য করে।
২. গুরুত্ব	জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে।	বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে। বিশ্ব
৩. সাম্রাজ্যবাদ	জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করে। উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলাফল হলো সাম্রাজ্যবাদী চেতনা।	উগ্র বাদেই আন্তর্জাতিকতাবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে। সকলে উন্নতি
৪. সভ্যতার বিকাশ	~~জাতীয়তাবাদ সভ্যতা বিকাশে~~ প্রতিবন্ধকস্বরূপ। উদা: বাঙালি জা:	আন্তর্জাতিকতাবাদ সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রযাত্রার মূল ভিত্তি। New York বহুজাতি

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পার্থক্য

বিষয়বস্তু	জাতীয়তাবাদ	আন্তর্জাতিকতাবাদ
৫. গণতন্ত্রের বিকাশ	জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ, জাতীয়তাবাদ সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী নয়	আন্তর্জাতিকতাবাদ সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রযাত্রার মূল ভিত্তি।
৬. বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতি	জাতীয়তাবাদ বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির বিরোধী।	আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণার প্রবর্তন করেছে।
৭. সংস্কৃতির বিনিময়	জাতীয়তাবাদ ভৌগোলিক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকে বলে সংস্কৃতির বিনিময়ে পথ রুদ্ধ থাকে।	আন্তর্জাতিকতাবাদ সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে উন্নত করে।
৮. দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ	জাতীয়তাবাদ জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের উদ্রেক করে।	আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতিসমূহের মধ্যে বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্পর্ক স্থাপন করে।

Universal Set

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)

‘সাম্রাজ্যবাদ’ শব্দটি কোনো নতুন ধারণা নয়। Imperialism বা সাম্রাজ্যবাদ কথাটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধারণ অর্থে সাম্রাজ্যবাদ হলো সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। অপর রাষ্ট্র দখল করে বা জয় করে, সেই রাষ্ট্রের মানুষকে জোর করে বিদেশি শাসনাধীনে আনা এবং অর্থনৈতিকভাবে তাদের শোষণ করাই সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য।

জোর দেখিয়ে
প্রভাব বিস্তার

USA

সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা

সাম্রাজ্যবাদ একটি বহু নিন্দিত ও বিকৃত ধারণা হলেও এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা মোটেই সহজ নয়। কারণ এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন –

- **মরগ্যানথু বলেন,** “কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক নিজ সীমানার বাইরে অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের প্রচেষ্টাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।”
- **জুলিয়াস বন- এর মতে,** “সাম্রাজ্যবাদ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার প্রধান লক্ষ্য হলো সাম্রাজ্য গঠন, সংরক্ষণ ও তাকে সংগঠিত করা।”

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)

- **চার্লস হজেজ এর মতে,** “সাম্রাজ্যবাদ হলো একটি দেশ কর্তৃক অন্য কোনো দেশের ওপর প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ।”
- **এইচ. জি. ওয়েলস বলেন,** “সাম্রাজ্যবাদ হলো একটি সচেতন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা।”
- **স্যুম্যান- এর মতে,** “একটি দেশের জনগণের ওপর বলপ্রয়োগ ও হিংসার মাধ্যমে বৈদেশিক শাসন চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাই হলো সাম্রাজ্যবাদ।”
- **চার্লস বেয়ার্ড বলেন,** “সাম্রাজ্যবাদ হলো কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখল করা এবং দখলকৃত ভূ-খণ্ডের ওপর নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা।”
- **ভি. আই. লেনিন- এর মতে,** “Imperialism: The Highest Stage of Capitalism.”
- **কাল কাউৎস্কির- এর মতে,** “সাম্রাজ্যবাদ হলো অতি উচ্চ পর্যায়ের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদের ফসল।”

সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন, পর্তুগাল, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বিশ্বের অর্ধেক ভূখণ্ড এদের অধীন ছিল। ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছিল বৃহত্তর। আফ্রিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রাণকেন্দ্র।

নয়া সাম্রাজ্যবাদ (Neo-Imperialism)

সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক স্তর হলো নয়া সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদী শাসন হতে মুক্ত দেশগুলোকে নতুন কৌশলে শোষণ করার জন্য নতুন সাম্রাজ্যবাদী মডেল আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন আর কোনো রাষ্ট্রকে শোষণ করার জন্য সেই রাষ্ট্রকে দখল করতে হয় না। কোন রাষ্ট্রের খনিজ সম্পদ, জ্বালানিখাত, আর্থিকখাত, বাণিজ্যখাত প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সেই রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য করা সম্ভব।

বিশ্বায়ন, বাণিজ্য উদারীকরণ, মুক্তবাজার অর্থনীতি, অবাধ বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুনাফা লুণ্ঠন করে নয়া সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের আধিপত্য বজায় রাখে।

নয়া সাম্রাজ্যবাদের কৌশল

- Economic Zone
- EPZ
- FDI

১. **ঋণ প্রদান কর্মসূচি:** উন্নয়নের নামে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোকে বিভিন্ন শর্তযুক্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নয়া সাম্রাজ্যবাদীরা মুনাফা লুণ্ঠন করে থাকে।

২. **মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাণিজ্য উদারীকরণ:** মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাণিজ্য উদারীকরণ কর্মসূচির আওতায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করে থাকে। তারা তাদের বহুজাতিক ও একচেটিয়া কারবারির কোম্পানিগুলোকে সেইসব রাষ্ট্রে প্রেরণ করে তাদের বাণিজ্য খাত করায়ত্ব করার চেষ্টা করে থাকে।

৩. **সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন:** দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজনীতি ও কূটনীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে থাকে।

৪. **তাবেদার সরকার গঠন:** সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে তাদের পছন্দমতো তাবেদার সরকার গঠন করে।

৫. **সাংস্কৃতিক আগ্রাসন:** নয়া সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম উপায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানো। নিজেদের সংস্কৃতিকে তারা চলচ্চিত্র, নোভেল, নাটক, প্রবন্ধ, মুক্তচিন্তা প্রভৃতির নামে অন্যান্য দেশে প্রচার ও প্রসার করার মাধ্যমেও তারা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রসন বজায় রাখার প্রচেষ্টা করে থাকে।

উপনিবেশবাদ (Colonialism)

উপনিবেশবাদ শব্দটি সাম্রাজ্যবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হলেও উপনিবেশবাদের পৃথক অর্থ রয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উপনিবেশবাদকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা হয়। উপনিবেশ বলতে নতুনভাবে বসতি স্থাপন বোঝায়। সাধারণভাবে কোনো এলাকা থেকে সমবেত কোনো জনগোষ্ঠী অন্য এলাকায় বসতি স্থাপন করলে তাকে উপনিবেশ বলে। উপনিবেশ স্থাপন করার ধারনা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। নিজ দেশে অভাব-অনটন, খাদ্যাভাব, ধর্মীয় সংঘর্ষ, শাসকের সাথে বিরোধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে স্থানের অভাব কিংবা ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বার্থে মানুষ একস্থান থেকে অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করেছে।

উপনিবেশবাদের সংজ্ঞা

- **জে.এ. হবসন- এর মতে,** “সঠিক অর্থে উপনিবেশবাদ হলো জাতীয়তাবাদের একরূপ স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ বা সম্প্রসারণ। যে নতুন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে উপনিবেশবাদীরা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তাদের নিজস্ব সভ্যতাকে অনুপ্রবেশ করার যে ক্ষমতা তারা ভোগ করেন, তাই উপনিবেশবাদের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে।”

উপনিবেশবাদ (Colonialism)

- **রূপাট এমার্সন এর ভাষায়,** "ঔপনিবেশিকতা হলো কোনো বিদেশি জনগণের ওপর দীর্ঘ সময় ধরে শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা বজায় রাখার ব্যবস্থা।"
- **রবার্ট ইয়ং এর মতে,** "Colonialism is simply the development for settlement or commercial intentions. However, colonialism still includes invasion."

প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশবাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই দুষ্কর। এ সম্পর্কে নানারূপ মতপার্থক্যও রয়েছে। এ সমস্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি যে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপনিবেশ বলতে এমন এক ভূখণ্ডকে বোঝায় যে ভূ-খণ্ডে অধিকাংশ মানুষের জীবন ব্যবস্থা ভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, যাদের সাথে তাদের বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি/কারণ/অভিপ্রায়

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে নানাবিধ বাস্তব কারণ বিদ্যমান থাকে। যার কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ স্থাপনে প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণগুলোর মধ্যে উপনিবেশবাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি অন্তর্নিহিত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

- **জাতীয় শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি:** উপনিবেশ স্থাপনের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ। উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পায়, আর সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পেলে জাতীয় শক্তি ও মর্যাদা স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হয়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে ব্রিটেনের বিশ্বব্যাপী প্রতাপ ও মর্যাদার কারণ ছিল তার বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া। কালক্রমে উপনিবেশ হারানোর ফলে ব্রিটেনের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে।
- **অর্থনৈতিক সুবিধা:** উপনিবেশবাদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ফায়দা বা সুবিধা অর্জন করা। মূলত অর্থনৈতিক কারণেই সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের উদ্ভব। উপনিবেশবাদীরা অধিকৃত এলাকা থেকে তাদের দেশের শিল্প-কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসেবে ঔপনিবেশিক ভূখণ্ড ব্যবহার করে। এটি ব্যতীত জনগণের ওপর বিভিন্ন প্রকার কর, খাজনা ইত্যাদি আরোপ করে জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করে তাদের অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত রাখে।

উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি/কারণ/অভিপ্রায়

- **শাসন ক্ষমতার বিস্তার:** উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে অধিগ্রহণকারী রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতার বিস্তার বা প্রসার ঘটে। দখলীকৃত ভূ-খণ্ডে দখলদার রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এমনকি শাসনব্যবস্থা দখলদার রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের নামেও পরিচালিত হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে রাজা/রানির নামে শাসন অব্যাহত ছিল।
- **রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ:** উপনিবেশবাদে অধিকৃত এলাকায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে ঔপনিবেশিক শাসকের অধীনে থাকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও তেমন লক্ষ করা যায় না। ধীরে ধীরে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।
- **জাতীয় প্রতিরক্ষা ও সামরিক সুবিধা:** উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ জাতীয় প্রতিরক্ষা ও সামরিক দিক থেকে নানাবিধ সুবিধা অর্জন করে থাকে। অধিকৃত ভূ-খণ্ডে জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থের ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অধিকৃত এলাকার সামরিক বাহিনী দখলদারদের অংশবিশেষ হিসেবে বিবেচিত হয়। যুদ্ধের সময় দখলদার রাষ্ট্র দখলকৃত এলাকা থেকে অনায়াসে সৈন্য সংগ্রহ করতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড এভাবে তাদের উপনিবেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে।

উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি/কারণ/অভিপ্রায়

- **অতিরিক্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসন:** অনেক ক্ষেত্রে নিজ দেশের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসনের স্বার্থে ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নিজ দেশে যখন ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয় তখন উপনিবেশ এলাকায় উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে স্থানান্তরিত করে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করা হয়।
- **সাংস্কৃতিক পুনর্বিন্যাস:** উপনিবেশবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ঔপনিবেশিক এলাকার সাংস্কৃতিক পুনর্বিন্যাস। উপনিবেশ শক্তি শুধু ভূখণ্ড দখল ও শাসন বিস্তার করে শান্ত থাকে না । তারা দখলকৃত এলাকার জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তনের সূচনা করে। পর দেশের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার কারণে ধীরে ধীরে অধিকৃত এলাকার জনগণের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হতে থাকে।
- **ধর্ম প্রচার:** উপনিবেশ বিস্তারের সাথে সাথে ধর্ম প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করে ধর্ম যাজকরা। ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন মিশনারি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সাহায্য সহযোগিতার নামে নানাভাবে দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগণকে প্রভাবিত করে ধর্মান্তরে প্রেরণা যোগায়।
- **শ্রেণিবিভেদ:** শ্রেণিবিভেদ সৃষ্টি উপনিবেশবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নিজ স্বার্থে অধিকৃত ভূ-খণ্ডের জনগণের মধ্যে নানারূপ শ্রেণিবৈষম্য ও বিভাজন সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগায় ।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মধ্যে পার্থক্য

সাম্রাজ্যবাদ	উপনিবেশবাদ
✓ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হলো সাম্রাজ্যবাদ। পুঁজিবাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্যই সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি।	✓ উপনিবেশবাদ হলো অন্য রাষ্ট্রের জনগণের উপর দীর্ঘ সময় ধরে শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা বজায় রাখার ব্যবস্থা।
✓ সাম্রাজ্যবাদ একটি ধারণা (Concept)।	✓ উপনিবেশবাদ একটি কর্ম (Action)।
✓ সাম্রাজ্যবাদে বসতি স্থাপন মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। বসতি স্থাপন করে বা না করে তাদের সাম্রাজ্য টিকে রাখে।	✓ উপনিবেশবাদে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা টিকে রাখে।
✓ অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট।	✓ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত।
✓ এটি উপনিবেশবাদের প্রাথমিক স্তর।	✓ এটি সাম্রাজ্যবাদের বহিঃপ্রকাশ।
✓ এরা দখলীকৃত রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল অবস্থান করে না। এক সময় নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে।	✓ এরা দখলীকৃত রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল অবস্থান করে।
✓ দখলীকৃত রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তন না করেও তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে।	✓ দখলীকৃত রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে।
✓ দখলীকৃত রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল গঠন করে না এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন করে না।	✓ দখলীকৃত অঞ্চলে রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন করে।
✓ সাম্রাজ্যবাদ প্রাচীন ধারণা। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য থেকে এই ধারণার প্রচলন শুরু হয়।	✓ উপনিবেশবাদ তুলনামূলক নতুন ধারণা। পনের শতাব্দীতে উপনিবেশবাদের সূচনা হয়।

নয়া উপনিবেশবাদ

সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ ও আধুনিকতম রূপ হলো নয়া উপনিবেশবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শাসন হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার পর বিশ্বে পুনরায় নতুন কৌশলে যে সাম্রাজ্যবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে, তাকেই নয়া উপনিবেশবাদ বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

FDI

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ

নয়া উপনিবেশবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মুক্তি প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করলেও পরোক্ষভাবে তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ জীবন, সামাজিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তি সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

নয়া উপনিবেশবাদ (Neo-colonialism) শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ১৯৬০ এর দশকে ঘানার প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান কোয়ামে নক্রুমা। ✓

নয়া উপনিবেশবাদ

নয়া উপনিবেশবাদের প্রামাণ্য সংজ্ঞা

- John Strachey তার The End of Empire গ্রন্থে নয়া উপনিবেশবাদ সম্পর্কে বলেছেন, "শাসন আর শোষণ দুই-ই আছে। পরিবর্তন হয়েছে শুধু শোষণের কৌশল।"
- B.S. Cohn এর মতে, "নব্য উপনিবেশবাদ হলো একটি দেশের উপর অন্য একটি দেশের যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব।"
- অধ্যাপক শামসুল হুদার মতে, "নতুন পোশাকে একই ব্যক্তি যেমন, নব্য উপনিবেশবাদ তেমন।"
- কোয়ামে নক্রুমার মতে, "Neo-Colonialism: The last stage of Imperialism."

অর্থনীতি / রাজনীতি /

সুতরাং আমরা বলতে পারি, নয়া উপনিবেশবাদ হলো পরোক্ষ উপায়ে উন্নত দেশ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার নয়া কৌশল।

নয়া সাম্রাজ্যবাদ/নব্য ঔপনিবেশিক শোষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

Meticulous Merits

দূরদর্শী Policy Making,

Negotiation (Win-Win Situation)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অবকাঠামো উন্নয়ন (Infrastructure)

Education

- অর্থনৈতিক শোষণ
- বাজার দখল
- সামরিক জোট গঠন ও সামরিক চুক্তি সম্পাদন
- সামরিক ঘাটি স্থাপন
- পুতুল/তাবেদার সরকার গঠন
- শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ

উত্তর আধুনিকতাবাদ

উত্তর আধুনিকতাবাদ ধারণাটির জন্ম ১৯৪০-১৯৫০ সময়কালে। যুদ্ধোত্তর কালীন সময়ে ফ্রান্সের কিছু দার্শনিক এই তত্ত্বটি আলোচনায় নিয়ে আসেন। আশির দশকের পর "উত্তর আধুনিকতাবাদ" ধারণাটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত হয়। আধুনিক যুগে যেখানে বিশ্বজনীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, সেখানে উত্তর আধুনিকতাবাদে জোর দেয়া হয়েছে বহুত্ববাদের উপর। মূলত বৈচিত্র্য ও বিশৃঙ্খলাই হচ্ছে উত্তর আধুনিকতাবাদের বৈশিষ্ট্য। উত্তর আধুনিকতাবাদের মূল বিষয় হলো সকল ক্ষমতার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের এবং সব জ্ঞানই বিদ্যমান ক্ষমতাকেন্দ্রিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। ক্ষমতার বাইরে সত্য (Truth) বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিজ্ঞজনেরা উত্তর আধুনিকতাবাদে ক্ষমতাকে সাধারণ সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে দেখানো চেষ্টা করেছেন।

উত্তর আধুনিকতাবাদ আধুনিকতাবাদবিরোধী একটি দার্শনিক আন্দোলনের নাম। উত্তর আধুনিকতাবাদীদের মতে, আমরা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি আধুনিকতার কারণে। অবশ্য কোনো কোনো মহল, যেমন দৃষ্টান্তবাদীরা, এমন কিছু মনে করেন না। তাদের মতে, অবক্ষয় বিভিন্ন কারণে আসতে পারে, কিন্তু এর জন্য কেবল আধুনিকতাকে দোষারোপ করা যায় না। [redacted] জাতিরাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবোধ, জাতীয়সংস্কৃতি, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদির বিরোধী।

ঐতিহ্য

উত্তর আধুনিকতা

ঐতিহ্য

উত্তর আধুনিকতাবাদ

ঐতিহ্য

সংস্কৃতি

উত্তর আধুনিকতাবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- শিল্পকলার নতুন ধারা
- শিল্পায়ন ও নগরায়নে দ্রুত প্রসার
- ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ
- শিক্ষার প্রসার
- আন্তর্জাতিক সম উন্নয়নের ধারণার বিকাশ
- আন্তর্জাতিকতাবাদের উদ্ভব
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রসার

পুঁজিবাদ

কুটির শিল্প +

Handicraft ++

Product sell ++

বিশ্বায়ন

সাংস্কৃতিক

সমাজ বিজ্ঞানী রোনাল্ড রবার্টসন সর্ব প্রথম তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বায়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। বিশ্বায়নকে নানাভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ব্যাখ্যা করা যায়। এটি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ নয় এবং একটি বিতর্কিত ধারণাও বটে। বিশ্বের প্রতিটি অংশের সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠা করা বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য। তবে বিশ্বায়ন মূলত বাজার এবং অর্থনীতির সাথে জড়িত। এটি এমন এক বিশ্বের ধারণাকে তুলে ধরে যেখানে রাষ্ট্রীয় সীমানা বা জাতীয় সীমারেখার কোনো ভূমিকা থাকবে না। অর্থাৎ The world is open and free for all ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। যাই হোক, বিশ্বায়ন সম্পর্কে কয়েকজন তাত্ত্বিকের মত ও সংজ্ঞা প্রদান করা হলো।

মুক্ত [illegible]

- **S. Judge Pramjit Ga এর মতে,** "Globalization is the domination of capital making market."
- **বিশ্বায়নের প্রথম তাত্ত্বিক রবার্টসনের মতে,** "বিশ্বায়ন হলো সমগ্র বিশ্বের সংকোচন এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি।" (The compression of the world and the intensification of the consciousness of the world as whole.)
- **সমাজ বিজ্ঞানী মার্টিন আলব্রো এবং এলিজাবেথ কিং এর মতে,** "বিশ্বায়ন হলো এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে একটি একক বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ে আসার উদ্যোগ।"

বিশ্বায়নের মৌলিক দিক

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বিশ্বায়নের ৪টি মৌলিক দিক আলোচনা করেছেন। যথা-

১. বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের প্রসার।

২. বিশ্বব্যাপী পুঁজির বিকাশ ও বিনিয়োগ সঞ্চালন।

৩. বিশ্বব্যাপী শ্রমের গতিশীলতা।

৪. বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতি।

Merits

(i) Education ০৪

(ii) FDI

(iii) Employment

(iv) ICT

(v) Patent, copyrights

(vi) Trade.

Demerits

(i) LDCs

(ii) Destroy of handicrafts.

Local sell decrease

(iii) আয়বৈষম্য বৃদ্ধি

(iv) Debt, Trap ঋণ ফাঁদ

বিশ্বায়নের মূল চালিকা শক্তি

- ✓ তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ
- ✓ মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও অবাধ বাণিজ্য নীতি FTA Free Trade
- ✓ পুঁজি ও বিনিয়োগ সঞ্চালন
- ✓ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমতা
- ✓ জাতি রাষ্ট্রগুলোর সীমানা উন্মুক্তকরণ
- ✓ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ
- ✓ জ্ঞান বিতরণ
- ✓ রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন

বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব

- তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ
- ঐক্যবদ্ধতা
- কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান
- ব্যক্তি স্বাধীনতার উদ্ভব
- গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান প্রদান বৃদ্ধি
- বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- বাণিজ্যের প্রসার
- ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ
- মানব সভ্যতার বিকাশ

বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব/ তৃতীয় বিশ্বে/দরিদ্র দেশসমূহে বিশ্বায়নের প্রভাব

অসম প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যব্যবস্থা ✓

ব্যাপক ধনবৈষম্যের সৃষ্টি ✓

প্রকট ঋণ ও বাণিজ্যসংকট

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা

আন্তর্জাতিক সাহায্য হ্রাস

✓ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সম্প্রসারণ

কুটির
শিল্প
শিল্প ধ্বংস

দেশীয়
শিল্প
ধ্বংস

নয়া বিশ্বব্যবস্থা

স্নায়ু যুদ্ধকালীন বিশ্ব ব্যবস্থা আবর্তিত হয়েছে দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে। স্নায়ু যুদ্ধের বাস্তবতা উপলব্ধি করে যুক্তরাষ্ট্র তার চিরাচরিত বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি 'Policy of Isolation' তথা 'Monro Doctrine' থেকে সরে এসে 'Policy of containment' বা 'Trueman Doctrine' গ্রহণ করেন। যার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুরো ইউরোপ জুড়ে প্রতিহত করা এবং ইউরোপে কম্যুনিস্ট আগ্রাসন প্রতিহত করা। এই জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোকে 'Marshall plan' এর আওতায় প্রচুর অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে। আর সামরিক প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয় NATO, CENTO আর এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে তোলে WARSHAW Pact. কিন্তু ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। জর্জ ওয়াকার বুশ যার নাম দিয়েছেন New World Order বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা।

1945 — 1991 ২ মেরু vs

1991

নয়া বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

• স্নায়ু যুদ্ধের অবসান ঘটেছে।	• গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে।
• একমেরু বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে।	• সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলুপ্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে।
• আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।	• বিশ্ব রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা হ্রাস পেয়েছে।
• পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে।	

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পরিবেশের নানা উপাদানকে মানুষ তার প্রয়োজনে যথেচ্ছা ব্যবহার করার ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী সার্বিক পরিবেশের বিপর্যয়কেই অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব পরিবেশ যে সকল হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে –

১. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ✓   ২. ওজোনস্তর ক্ষয় ✓   ৩. মরুকরণ
৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি   ৫. জীববৈচিত্র্য ধ্বংস
৬. নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও সমুদ্রের লবণাক্ততা বৃদ্ধি   ৭. পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি

USD 100 bil.
কিয়োটো
Paris চুক্তি
COP

বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয় দুই-এক দিন বা দুই-এক বছরে হয়নি। বছরের পর বছর মানুষ পরিবেশকে তার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে গিয়েই পরিবেশকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে। বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়ের পেছনে সবচাইতে দায়ী বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলো। এসকল রাষ্ট্র তাদের শিল্প এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে গিয়ে পরিবেশকে ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে। যার বেশির ভাগ প্রভাব পড়েছে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর উপর। পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে আগামী শতাব্দীতে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। তাই আগামী পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষ ধনী-দরিদ্র, উত্তর-দক্ষিণ ভেদাভেদ ভুলে জননী তুল্য পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসা উচিত।

জলবায়ু শরণার্থী

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিজ বাসস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু শরণার্থী বলা হয়। ২০০০ সালের পরবর্তী সময় থেকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নসহ নানাবিধ জলবায়ু সমস্যা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে 'জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যাও।

কারণ

১.বছরজুড়ে গড় তাপমাত্রার বিশাল পরিবর্তন।
২.উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে নিরাপদ পানির সংকট।
৩.জমিগুলোর উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার দরুন তীব্র খাদ্য সংকট।
৪.অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা ইত্যাদি।

উপকূলবর্তী

বাংলাদেশে প্রভাব

নিউইয়র্ক টাইমসের করা অনুসন্ধানী এক রিপোর্টে উঠে এসেছে, ক্রমবর্ধমান এই লবণাক্ততা বাংলাদেশের ১৫ লাখ উপকূলীয় মানুষকে তাদের বাসস্থান থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছে, যাদের বেশিরভাগই রাজধানী ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছে। পৃথিবীজুড়ে 'জলবায়ু শরণার্থী'র বেশিরভাগই হতে যাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে।

জলবায়ু কূটনীতি

ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো জলবায়ু কূটনীতি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে জলবায়ু কূটনীতি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহ, যারা জলবায়ু দূষণ ও পরিবর্তনে অধিকতর ভূমিকা রাখছে, তাদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে সাহায্য করাই বর্তমানে জলবায়ু কূটনীতির প্রধান লক্ষ্য।

গতানুগতিক কূটনীতি থেকে স্বভাবতই জলবায়ু কূটনীতির প্রকৃতি, কৌশল, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ভিন্ন। প্রচুর ভারী শিল্পকারখানা সমৃদ্ধ যে ধনী রাষ্ট্রসমূহ প্রতিনিয়ত CO_2, SO_2 এর মত গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো উৎপাদন করে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে; তাদের এই কর্মকাণ্ডের ফলে মালদ্বীপ বা ওশেনিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্র দ্বীপগুলো নিকট ভবিষ্যতে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধিতে তলিয়ে যাবার শংকায় রয়েছে। সারা দুনিয়াতেই সামনের ৫০ বা ১০০ বছরের লক্ষ কোটি মানুষ জলবায়ু শরণার্থীতে পরিণত হতে যাচ্ছে। অত্যাধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশ সমূহের এসকল ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তা নিয়ে দর কষাকষি করা জলবায়ু কূটনীতির প্রধান সাফল্য।

গ্রিন হাউজ

গ্রিন হাউজ কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। শীত প্রধান দেশে যেখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকে সেখানে স্বচ্ছ কাচের (Glass) ছাউনিযুক্ত ঘর তৈরি করা হয়। এই ঘরকে গ্রিন হাউজ বা সবুজ ঘর বলা হয়। শীতের দিনে পরিবেশের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকলেও সবুজ ঘরের ভিতর তাপমাত্রা ৩৮° সেলসিয়াস থেকে ৩৯° সেলসিয়াস (১০০° - ১২০°F) এর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকে। একইভাবে ভূপৃষ্ঠ বেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলকে একটি কাচের ঘরের সাথে তুলনা করা হয়। কারণ কাচের ভেতর দিয়ে সূর্য রশ্মি প্রবেশের পর প্রতিফলনের সময় সূর্য রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটে ফলে কাঁচ ভেদ করে রশ্মি বাইরে আসতে না পেরে ভেতরে আটকে পড়ে। দ্রুত বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত কার্বন ডাই অক্সাইড তাপকে প্রতিফলিত হতে না দিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখে, এতে সূর্য থেকে আগত তাপ এবং ভূ-কেন্দ্র থেকে নির্গত তাপ মিলে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হতে থাকে এবং ভূপৃষ্ঠে নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হয় এটিকে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট বলে।

গ্রিন হাউজ

গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ

৪২।

গ্রিন হাউজ গ্যাসগুলো হলো- ক. কার্বন ডাই অক্সাইড – CO_2, খ. মিথেন- CH_4, গ. জলীয় বাষ্প – H_2O ঘ. ওজোন গ্যাস- O_3; ঙ. নাইট্রাস অক্সাইড – N_2O এই গ্যাসগুলোকে সামগ্রিকভাবে গ্রিন হাউজ গ্যাস বলা হয়।

গ্রিন হাউজ ইফেক্টের কারণ

যে পরিবেশে মানুষ বসবাস করছে তাই ধ্বংস করছে মানুষ। বিভিন্ন কারণে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট বা প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। নিম্নে কারণগুলো উল্লেখ করা হলো—

ক. অরণ্য নিধন (Deforestration);

খ. জীবাশ্ম জ্বালানির অবাধ ব্যবহার;

গ. অতিরিক্ত কার্বন অবমুক্তকরণ;

ঘ. কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল, গ্যাসোলিন প্রভৃতির অসম্পূর্ণ দহন।

গ্রিন হাউজ

গ্রিন হাউজ ইফেক্টের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া

পরিবেশ ও কৃষির উপর গ্রিন হাউজ গ্যাসের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মারাত্মক। কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্প এবং ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা CFC তে পরিমাণের তারতম্য ঘটলে পরিবেশ বিপর্যস্ত হবে, কৃষি ধ্বংস হবে, পৃথিবীতে খাদ্য সংকট সহ নানা প্রকার পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিবে।

পরিবেশ ও কৃষিতে গ্রিন হাউজ গ্যাসের প্রতিক্রিয়া

✓ বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়বে	✓ কৃষি উৎপাদন হ্রাস করবে
✓ ওজোন গ্যাস হ্রাস পাবে	✓ অতিবৃষ্টি ও এসিড বৃষ্টির প্রকোপ বাড়বে
✓ মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাবে	✓ নিয়মিত বনাঞ্চল ধ্বংস হবে
✓ সামুদ্রিক জলের আয়তন প্রসারিত হবে	✓ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাবে
✓ IDP বা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যা ও জলবায়ু শরণার্থী বাড়বে	✓ নিম্নভূমির বনাঞ্চল তলিয়ে যাবে
✓ মিঠা পানিতে লোনা পানির প্রবেশ ঘটবে	✓ বাস্তুসংস্থানের বিপর্যয় ঘটবে

গ্রিন হাউজ

গ্রিন হাউজ গ্যাসের ভারসাম্যহীন মাত্রা মানব জাতির জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। গ্রিন হাউজ গ্যাসের মাত্রাধিক্যের কারণে পরিবেশ বিপর্যস্ত হবে এবং কৃষি উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি করবে। এই গ্যাসগুলোর মাত্রাতিরিক্ত অবমুক্তির ফলে বায়ুমণ্ডলের অধিক পরিমাণে উষ্ণতা বাড়বে। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা তলিয়ে যাবে। বাস্তুহারা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। সর্বোপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ উত্তরোত্তর বেড়ে যাবে। তাই বিশ্বকে এখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট মোকাবেলায় সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

ওজোনস্তর ক্ষয়

03

নীল রংয়ের মেছোগন্ধযুক্ত গ্যাসীয় পদার্থই হলো ওজোন। তিনটি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে একটি ওজোন অনুগঠিত হয়। তাই ওজোনকে অক্সিজেনের রূপভেদ বলা যেতে পারে। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে স্কোনবি (Sconbein) সর্বপ্রথম ওজোনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। গ্যাসটি বিশিষ্ট গন্ধের জন্য নামকরণ করা হয় ওজোন (গ্রীক ওজো OZO কথার অর্থ to smell)। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে প্রাকৃতিক কারণে অক্সিজেন এবং অক্সিজেন পরমাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাস উৎপন্ন হয়, কিন্তু ট্রপোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ারে কখনোই ওজোন উৎপন্ন হয় না। আবার স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে সর্বত্র ওজোনের ঘনত্ব সমান নয়। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ১৫-৩৫ কি. মি. উচ্চতার মধ্যে ওজন গ্যাসের ঘনত্ব সর্বাধিক। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে সীমাবদ্ধ ওজোন গ্যাসের এই পুরো আবরণ (চাদর) কে ওজোন স্তর বা Ozon Layer বলে।

গ্যাসের এ স্তর সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন ক্ষতিকর রশ্মি যেমন, গামা রশ্মি ইত্যাদি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। CFC সহ আরো কিছু গ্যাস ওজোন গ্যাসের পরমাণু গঠন ভেঙ্গে দেয়। বায়ুমণ্ডলে CFC ও এ ধরনের অন্যান্য গ্যাস বৃদ্ধির ফলে ওজোন স্তরের ক্ষয় হয়। ফলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি সহজে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে। যা মানুষ ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ওজোন স্তর ক্ষয় রোধ করার জন্য বিশ্বব্যাপী সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ১৯৮৭ সালে ওজোন স্তর ক্ষয় রোধকল্পে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

প্রথম পরিবেশ সম্মেলন

১৯৬৮ সালের ৩০ জুলাই জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)-এর ৪৫তম অধিবেশনে এবং ১৯৬৮ সালের ৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৩তম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রথম পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের নাম ছিল জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment)। বিশ্ব পরিবেশবাদ আন্দোলন স্টকহোম কনফারেন্স একটি মাইলফলক। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে পরিবেশকে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনীতির বৃহৎ পরিসরে দেখার সুযোগ করে দেয়। স্টকহোম কনফারেন্সের ফলে বিশ্বে পরিবেশগত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় ,এমনকি অনেক দেশে জাতীয় পরিবেশ কর্ম-পরিকল্পনা বা নীতি গ্রহণ করা হয়।

এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭২ সালে UNEP (United Nations Environment Programme) গঠন করা হয়। একই বছর UNEP কর্তৃক ৫ জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে এ দিবসটি যথারীতি পালন হয়ে আসছে।

মন্ট্রিল সম্মেলন, ১৯৮৭

১৯৮৭ সালে মন্ট্রিলে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ওজোনস্তর বিনষ্টকারী দূষিত রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ধরিত্রী সম্মেলন, ১৯৯২

জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনিরোতে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫টি দেশের সাড়ে তিন হাজার প্রতিনিধি এতে অংশ নেয়। সম্মেলনে ১৯৭২ সালের ১৬ জুন স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনের ঘোষণার প্রতি পুনঃসমর্থন ব্যক্ত করা হয়। রিও ডি জেনিরোতে সম্মেলনে ২৭টি নীতিমালা অনুমোদিত হয়। তন্মধ্যে মুখ্য নীতিমালাগুলো হচ্ছে –

- ✓ টেকসই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবে মানব সম্পদ।
- ✓ রাষ্ট্রসমূহ বিশ্ব অংশীদারিত্বের চেতনায় বিশ্বের পরিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সুস্থতা ও পূর্ণতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে।
- ✓ পরিবেশের অবক্ষয় বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো বস্তু বা কার্যক্রম একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিরুৎসাহিত ও প্রতিরোধে রাষ্ট্রসমূহ কার্যকরী সহায়তা প্রদান করবে।
- ✓ রাষ্ট্রসমূহ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধরিত্রী সম্মেলন +১০, ২০০২

২০০২ সালের ২৬ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে দ্বিতীয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন বা বিশ্ব টেকসই সম্মেলন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশকে ক্ষতি না করে বিশ্বকে টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে এ সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পাঁচটি সেবামূলক ক্ষেত্র- পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, কৃষি উৎপাদনশীলতা ও জীববৈচিত্রের মতো ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এ শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনার জন্য চিহ্নিত করেন। এ সম্মেলনে আরো যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলো:

- ✓ জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা।
- ✓ জীবন রক্ষাকারী চাহিদা মেটাতে দরিদ্র দেশগুলো যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার একটা বিকল্প উপায় পেতে পারে তা নির্ধারণ করা।
- ✓ ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে দারিদ্র্য অর্ধেক কমিয়ে আনা। ধনী-দরিদ্র দেশের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস। বিনিয়োগ প্রবাহকে টেকসই উন্নয়নের সাথে সমন্বয় করার অঙ্গীকার।
- ✓ সকল মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রেখে একটি মানবিক নিরপেক্ষ এবং নিরাপদ বিশ্ব সমাজ গঠন করা হবে। মানবিকতার চরম অবস্থা অনুধাবন করে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবিক উন্নয়ন সাধন করতে পারে এমন একটি বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা হবে।
- ✓ পূর্ববর্তী পরিবেশ বিপর্যয় সংক্রান্ত ঘোষণাগুলো বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং বাস্তবায়িত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হবে।
- ✓ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নশীল বিশ্বের খাদ্য চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- ✓ বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ঐকমত্য হয়। ২০১৫ সালের মধ্যে প্রজাতির বিলুপ্তির হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো।

রিও+২০ সম্মেলন, ২০১২

১৯৯২ সালের পরে ২০ জুন, ২০১২ সালে পুনরায় ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় রিও+২০ সম্মেলন। এ সম্মেলনের মূল শ্লোগান ছিল দুটি-

১. টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সবুজ অর্থনীতি এবং

২. টেকসই উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি,

টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে একটি আলাদা স্তম্ভ হিসেবে মেনে নেয়া হবে বলে বলা হয় এ সম্মেলনে।

1995

1995

কপ (COP) সম্মেলন, ১৯৯৫

COP (Conference of the Parties) হলো UNFCCC কর্তৃক আয়োজিত জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনের নাম। কপ-১ বা প্রথম বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল, ১৯৯৫ সালে। জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ১৯৬টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।

UNFCCC

✓ COP-15 বা কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলন

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণের জন্য ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন এ দুই সপ্তাহব্যাপী একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা COP-15 নামে পরিচিত। এ সম্মেলনে ১৯৪টি দেশ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ এবং অসংখ্য পরিবেশবাদী সংগঠন অংশগ্রহণ করে। COP-15 সম্মেলনে গৃহীত চুক্তির প্রধান প্রধান দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো –

- ✓ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমনের হার কমিয়ে আনতে হবে।
- ✓ ২০১০ সালের শেষ নাগাদ একটি বাধ্যতামূলক আইনি চুক্তি প্রণয়ন করার জন্য সমঝোতার সঙ্গে একটি সুপারিশ সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে উন্নত দেশগুলো তাদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, অন্যান্য দ্বীপ রাষ্ট্র, স্বল্পোন্নত দেশসমূহ এবং আফ্রিকার দেশসমূহকে। এ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে শিল্পোন্নত দেশসমূহ যৌথভাবে প্রতি বছর ১ হাজার কোটি ডলার করে সাহায্য দিয়ে যাবে ২০২০ সাল পর্যন্ত।

[illegible]

COP – 21

cop-২১

২০১৫ সালের জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন, COP-21 ফ্রান্সের প্যারিসে 30 নভেম্বর থেকে 12 ডিসেম্বর 2015 পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই গৃহীত হয় ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি।

প্যারিস চুক্তি

‘প্রকৃতি ও পরিবেশ’ রক্ষায় এ পর্যন্ত যতগুলো চুক্তি সম্মেলন ও সমঝোতা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্যারিস জলবায়ু চুক্তি। cop-২১ কেননা এর আগে কপ – ২০ পর্যন্ত শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে এতটা মতৈক্য তৈরি করতে পারেনি। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের আওতায় জলবায়ু সনদ তৈরি হয়। এই প্রটোকলে ১৮৭টি দেশ স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির প্রথম পর্যায়ের মেয়াদ শেষ হয় ২০১২ সালে। আর এরই মধ্যে ধারাবাহিকতায় প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ২ জুন, ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দিলে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হুমকির মুখে পড়ে। কারণ, কার্বন নিঃসরণকারী দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে দ্বিতীয়।

কপ-২৬ (COP-26)

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে ৩১ অক্টোবর, ২০২১ থেকে ১২ নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত COP-26 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য ছিল -

- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন অর্ধেকে নামিয়ে আনা, যা অর্জন করতে হলে কার্বনের নির্গমন ৪৫% কমাতে হবে। আর ২০৫০ সালের মধ্যে নির্গমন আনতে হবে শূন্যে।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার করে সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ২০০৯ সালে। বলা হয়েছিল, ২০২০ সালের মধ্যে এই সহায়তা কার্যকর হবে। তবে তা আবার ২০২৩ সাল পর্যন্ত পেছানো হয়েছে।
- ✓ এছাড়াও ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস মিথেনের নিঃসরণ ৩০% কমানোর এবং বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা COP-26 সম্মেলেন চার দফা দাবি পেশ করেছেন –

- ✓ প্রধান কার্বন নিঃসরণকারীদের অবশ্যই উচ্চাভিলাষী জাতীয় পরিকল্পনা (Nationally Determined Contributions, NDC) দাখিল এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ✓ উন্নত দেশগুলোকে অভিযোজন এবং প্রশমনে অর্ধেক অর্ধেক (৫০:৫০) ভিত্তিতে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।
- ✓ উন্নত দেশগুলোকে স্বল্প খরচে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি সরবরাহ করতে হবে।
- ✓ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভাঙন, বন্যা ও খরার মতো দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জলবায়ু অভিবাসীদের দায়িত্ব নেওয়া সহ জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে ক্ষতি ও ধ্বংস মোকাবেলা করতে হবে।

কপ-২৭ (COP-27)

মিশরের শারম আল শেখে ২০২২ সালের ৬ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত কপ-২৭ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের প্রধান ফলাফল হলো-

COP 27

✓ প্রথমবারের মতো ‘লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড’ গঠনে ঐকমত্য। বন্যা, খরা এবং জলবায়ু সংক্রান্ত অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে এখান থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। তবে ‘লস অ্যান্ড ড্যামেজ’ তহবিলের আকার কত বড় হবে, কীভাবে কোন উৎস থেকে অর্থের যোগান আসবে আর এর বন্টন কীভাবে কোন পদ্ধতিতে হবে এসবই চূড়ান্ত হবে পরবর্তী সম্মেলনে।

✓ এ সম্মেলনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকের মধ্যে রয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস ৪৫% হ্রাস করা।

✓ ২০৩০ সাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রতিবছর কমপক্ষে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা যেন ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমনে শূন্যতে পৌঁছাতে সক্ষম হওয়া যায়।

✓ বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানায় উন্নত দেশগুলো। ২০১৫ সালে ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তিতে দেশগুলো তাপমাত্রা কমানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। → COP-21

✓ ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল গঠন করে স্বল্পোন্নত বিপদাপন্ন দেশগুলোর আস্থা পুনরুদ্ধার করা।

মন্ট্রিল (কানাডা) প্রটোকল

এটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮৭ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৮৯ সালে। এর সদস্য সংখ্যা ১৯৭ টি দেশ। এই প্রটোকলটি বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে অবস্থিত ওজোনস্তর রক্ষা বিষয়ক। ১৯৯৬ সালের মধ্যে সিএফসি হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট বাংলাদেশ মন্ট্রিল প্রটোকলে স্বাক্ষর করে। ১৬ সেপ্টেম্বর এ প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় বিধায় ১৬ সেপ্টেম্বর ওজোনস্তর রক্ষা দিবস। এ পর্যন্ত পাঁচবার এটি সংশোধিত হয়েছে। ৫ম সংশোধনী আনা হয় ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর রুয়ান্ডার কিগালিতে।

কিয়োটো (জাপান) প্রটোকল

সাধারণ অর্থে কিয়োটো প্রটোকল জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) সংক্রান্ত একটি বহুপাক্ষিক চুক্তি। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও গ্রিন হাউস গ্যাস উদ্‌গিরণ কমানোর জন্য স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে কার্যকর হয়। নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বিশ্বে ১৯২টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ উক্ত প্রটোকল অনুসমর্থন (Rectified) করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৩৭টি উন্নয়নশীল দেশ। USA, Canada, South Sudan প্রটোকল অনুসমর্থন করেনি। ২০১২ সালে Canada নিজেকে Kyoto Protocal হতে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। চীন এবং ভারত গ্রিন হাউস নির্গমনে অন্যতম শীর্ষে থাকলেও তাদের ক্ষেত্রে নির্গমন মাত্রা প্রযোজ্য নয়।

কিয়োটো প্রটোকলের সংজ্ঞা (Definition of Kyoto)

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি UNEP প্রদত্ত সংজ্ঞা নিম্নরূপ “কিয়োটো প্রটোকল একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যার অধীনে শিল্পোন্নত দেশসমূহ সম্মিলিতভাবে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমপক্ষে ৫ শতাংশ হ্রাস করবে। ২০১২ সালের মধ্যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার হেক্সোফ্লোরাইড, এইচএফসি এবং সিএফসি - এই ৬টি গ্রিন হাইজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস করবে। জাতীয় পর্যায়ে এই হ্রাসকরণের হার ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ৮ শতাংশ; যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ৭ শতাংশ; জাপানের জন্য ৬ শতাংশ; এবং রাশিয়ার জন্য ৩ শতাংশ।

কিয়োটো (জাপান) প্রটোকল

কিয়োটো প্রটোকলের মূলনীতি (Main Principles of Kyoto protocol)

'জাতিসংঘের Framework Convention of Climate Change UNFCCC এর অধীন কিয়োটো প্রটোকলের মূলনীতি ৬ টি। যথা:

- ✓ কিয়োটো প্রটোকল সরকার কর্তৃক লিখিত এবং জাতিসংঘের অধীন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হবে ।
- ✓ স্বাক্ষরকৃত রাষ্ট্রসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা:
  - ক. শিল্পোন্নত দেশসমূহ যাদের গ্যাস নির্গমন হ্রাস বাধ্যতামূলক; এবং
  - খ. শিল্পে অনগ্রসর দেশসমূহ যাদের গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন বাধ্যতামূলক নয়।
- ✓ যে সকল শিল্পোন্নত দেশ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিয়োটো প্রটোকল কর্তৃক নির্ধারিত গ্যাস নির্গমন হ্রাসের মাত্রা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয় তাহলে শাস্তি হিসেবে পরবর্তী টার্গেটে তাকে ৩০ % গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে হবে।
- ✓ সকল শিল্পোন্নত দেশসমূহকে ২০১২ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা সংশ্লিষ্ট দেশের ১৯৯০ সালের মধ্যে নির্গমনের মাত্রার চেয়ে ৫ শতাংশ কমাতে হবে।
- ✓ কিয়োটো প্রটোকলে Flexible Mechanism অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মাধমে শিল্পোন্নত দেশ গ্যাস নির্গমন কমাতে না পারলে তার পরিবর্তে নির্ধারিত আর্থিক ক্ষতিপূরণ অন্যান্য অনগ্রসর দেশগুলোকে প্রদান করবে।
- ✓ কিয়োটো প্রটোকলের মাধ্যমে জার্মানির বনভিত্তিক Clean Development Mechanism - CDM Project - প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কর্তৃপক্ষ আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাত্রা নির্ধারণ করবে এবং CDM Project - এর আওতায় যথাযোগ্য অনগ্রসর রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণের অর্থ সহায়তা প্রদান করবে।

কিয়োটো (জাপান) প্রটোকল

কিয়োটো প্রটোকলের উদ্দেশ্যে (Objectives of Kyoto)

কিয়োটো প্রটোকলের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা সহনশীল রাখা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ৫% হারে বেড়ে চলেছে। তা পৃথিবীকে এক সময় ধ্বংস করে দিতে পারে। Inter-governmental Panel on Climate change (IPCC) নামক সংস্থার প্রতিবেদন মোতাবেক ২১০০ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তা ৫-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। কিন্তু কিয়োটো প্রটোকলের বিধান মেনে চললে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা গড়ে ০.০২ ডিগ্রী থেকে ০.২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

✓ কার্টাগেনা প্রটোকল

কার্টাগেনা প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় ১৬ মে, ২০০০ সালে এবং কার্যকর হয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে। প্রটোকলটি কানাডার মন্ট্রিলে স্বাক্ষরিত হয়। এর মোট সদস্য সংখ্যা ১৭০টি, এটি মূলত জাতিসংঘের ✓ জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি। এখন পর্যন্ত ১৭৩টি দেশ এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ কার্টাগেনা প্রোটোকল অনুসমর্থন করে ২০০৪ সালে। এ প্রটোকলের ১৭ অনুচ্ছেদে Carbon Trading এর নিয়মনীতি উল্লেখ রয়েছে। ✓

পরিবেশবাদী সংগঠন

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

জাতিসংঘের এই পরিবেশবাদী সংস্থাটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা যা ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা (UNEP) ও জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা (WMO) এর সম্মিলিত রূপে IPCC গঠিত হয়। এর লক্ষ্য হলো সরকারগুলোকে সর্বস্তরের বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করা যাতে তারা জলবায়ুর নীতিগুলোর উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারে। IPCC এর রিপোর্ট আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনায় একটি প্রধান ইনপুট হিসেবে কাজ করে। এর নির্দিষ্ট কোনো সদর দপ্তর নেই। IPCC শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে ২০০৭ সালে।

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)

জাতিসংঘের পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৩-১৪ জুন, ১৯৯২, রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল; কার্যকর- ২১ মার্চ, ১৯৯৪; সদর দপ্তর বন, জার্মানি; বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে- ৯ জুন, ১৯৯২ এবং অনুমোদন করে- ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৪।

পরিবেশবাদী সংগঠন

UNEP (United Nations Environment Programme)

জাতিসংঘের পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি যা প্রতিষ্ঠা হয়— ৫ জুন, ১৯৭২; সদর দপ্তর- নাইরোবি, কেনিয়া। ২০০৪ সাল থেকে সংস্থাটি পরিবেশ নিয়ে ইতিবাচক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ’ পদক প্রদান আরম্ভ করে।

IUCN (International Union for the Conservation of the Nature)

আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচি যা প্রতিষ্ঠা হয়- ৫ অক্টোবর, ১৯৪৮; এর সদর দপ্তর- গ্লান্ড, সুইজারল্যান্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ’ জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) ২০০৪ সালে পদকটি প্রবর্তন করে। ‘চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ’ পদকটি চারটি ক্যাটাগরিতে প্রদান করা হয়। যথা: পলিসি, বিজ্ঞান, ব্যবসা ও সুশীল সমাজ। প্রতি বছর পদকটি পেয়ে থাকেন পরিবেশ বিষয়ে অসামান্য অবদান রাখা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সালে পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পদকে ভূষিত হন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার তার সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ‘চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ’ পদককে পরিবেশ বিষয়ের নোবেল বিবেচনা করা হয়।

কার্বন বাণিজ্য (Carbon Trade)

বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন বাস্তবতা হচ্ছে কার্বন বাণিজ্য। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড কম নিঃসরণের জন্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি ক্রেডিট বিনিময়ের নাম কার্বন বাণিজ্য। কিয়েটো প্রটোকলে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের একটি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একটি রাষ্ট্র তাদের কোটার চেয়ে বেশি কার্বন নির্গমনের অধিকার কিনতে হবে কম কার্বন নির্গমনকারী রাষ্ট্রের কাছ থেকে।

সীমার

[illegible] [illegible] [illegible]

কার্বন বাণিজ্যের সর্বপ্রথম সূত্রপাত হয় ১৯৯৭ সালের, ১১ ডিসেম্বর কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরের পর। সক্ষমতা সত্ত্বেও যে সব কোম্পানি কম দূষণ করে, তারা তাদের অব্যবহৃত দূষণের অধিকার বেশি দূষণকারী কোম্পানির কাছে অর্থের বিনিময় লেনদেন বা বিক্রি করে থাকে। এই প্রক্রিয়া একটি রেগুলেটরি কাঠামোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে, ক্রেতা কোম্পানি বা দেশটি তার ক্ষেত্রে বেধে দেওয়া নির্ধারিত সীমার মধ্যে কার্বন নিঃসরণ করছে কি না।

‘কার্বন ট্রেডিং’- মুক্তি নয়, বরং ফাঁদ

কিয়োটো প্রটোকলে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের একটি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু ধনী দেশগুলো নিজেদের সুবিধার জন্য Carbon Trading নামে নতুন একটি ধারণার জন্ম দেয়। যাতে শিল্পের অগ্রগতি রোধ না হয়, আবার গ্রিনহাউজ জাতীয় গ্যাসগুলো কম নির্গত হয়।

যেহেতু কার্বন নিঃসরণ একটি সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তাই যে দেশ সীমার চেয়ে কম নিঃসরণ করবে, সেই অনুপাতে তার নামে কার্বন ক্রেডিট জমা পড়বে। আর যারা সীমার চেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করবে, তারা সে ক্রেডিট কিনে নেবে। এ চুক্তির ফলে উন্নত দেশগুলো অর্থের বিনিময়ে তাদের কার্বন নিঃসরণের বৈধতা পাচ্ছে। এতে কার্বন নিঃসরণ কোনোভাবেই কমছে না বরং কার্বন ক্রেডিট কিনে উন্নত দেশসমূহ দায়মুক্তি পাচ্ছে এবং অবাধে কার্বন নিঃসরণ করে যাচ্ছে।

কিয়োটো প্রটোকলে কার্বন নিঃসরণের যে মাত্রা নির্ধারিত হয় বাংলাদেশ তার চেয়ে কম কার্বন নিঃসরণ করে। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো কার্বন বাণিজ্যের কারণে আপাতদৃষ্টিতে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে মনে হলেও, অদূর ভবিষ্যতে দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই বলা যায়, কার্বন ট্রেডিং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কোন ভালো উদ্যোগ নয় বরং এটি উন্নত বিশ্বের একটি পরিকল্পিত ফাঁদ।

কার্বন কর (Carbon Tax)

কার্বন কর বা কার্বন ট্যাক্স হলো পণ্য বা সেবা উৎপাদনের ফলে নির্গত কার্বনের উপর ধার্যকৃত কর বা ট্যাক্স। কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের জন্য তথা পরিবেশ দূষিত করার জন্য জ্বালানি ব্যবহারকারীকে যে ট্যাক্স দিতে হয় সাধারণত তাকেই কার্বন ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করা হয়। ৯০ এর দশকে ফিনল্যান্ড সর্বপ্রথম কার্বন কর চালু করে। এরপর ২০১২ সালে অস্ট্রেলিয়া কার্বন কর চালু করে।

কার্বন কর চালু করার উদ্দেশ্য

- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা।
- স্বল্প ব্যয়ে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানো।
- জনগণকে কার্বন সম্পন্ন জ্বালানি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা।
- গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে কর থেকে সাহায্য প্রদান করা।
- বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসকরণ।
- গ্রিনহাউস ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের রক্ষা করা।
- এই কর আরোপ করা হলে দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়।

কার্বন কর (Carbon Tax)

কার্বন করের নেতিবাচক প্রভাব

- কার্বন কর আরোপ করা হলে জ্বালানি ব্যবহারকারী কোম্পানি গুলো বন্ধ হয়ে যাবে।
- মানুষের বেকারত্ব বেড়ে যেতে পারে।
- মানুষের ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমে যাবে এবং গাড়ি শিল্প ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।
- অনেক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সমস্যা

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ‘খাদ্য জাতীয়তাবাদ’ (Food Nationalism) বলতে কী বোঝায়? কেন এর উদ্ভব হয়? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- বহুপাক্ষিকতা (Multilateralism) মানে কী? বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কি এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

New world order

- “নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা” ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিকতাবাদ ধারণাটি বিবৃত করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- চরম আবহাওয়ার ভয়াবহতাগুলো কী কী? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- জলবায়ু শরণার্থী (Climate refugee) বলতে কী বুঝায়? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য সমূহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- কপ (COP -22) এর মূল সিদ্ধান্ত গুলি কী কী? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মূল চালিকা শক্তি (Driving forces of Globalization) গুলো কী? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- কিয়োটো চুক্তি কী? এ চুক্তিটি কী উদ্দেশ্যে, কোথায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- উপনিবেশবাদ এবং নব্য-উপনিবেশবাদ বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ লিখুন। [৩৪তম বিসিএস লিখিত]
- "বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।"- আলোচনা করুন। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এপর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস লিখিত]
- বিশ্বায়ন বলতে কী বুঝায়? বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকতাবাদ কি একে অপরের প্রতিদ্বন্দী? [৩০তম বিসিএস লিখিত]
- বিশ্বায়ন সুযোগ এবং আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। "দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে সুযোগ-সুবিধা এবং অদক্ষদের জন্য আশঙ্কা।"- এই মন্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? আলোচনা করুন। [২৯তমবিসিএস লিখিত]
- কিয়োটা প্রটোকল কোথায় গৃহীত হয়? এর মেয়াদ কখন শেষ হবে? [২৯তম ও ৩২তম বিসিএস লিখিত]
- গ্রীন পিস কী? [২৯তম বিসিএস লিখিত]
- জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে- এই মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন। [২৯তম বিসিএস লিখিত]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়